অভিমন্যু

জেহিরুল হোসেন

ইচ্ছা আর অনিচ্ছার দো-টানার পবিত্র মেলার উদ্দেশে বেরিয়েছে। একদিকে নিজরা আর ছেলে মেয়ের আব্দার, অন্যদিকে অনন্তের ভর্ৎসনায় সে নিরুপায় হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গ্রামের মানুষ দল বেঁধে চলেছে। সমবয়সী দুই একজন পবিত্রকে কৃত্রিম আশ্চর্য করেছে। 'ওটা পবিত্র না? আজ দেখছি হাইটা মাটিতে নামছে। পবিত্র উত্তর না দিয়ে কেবলই হেসেছে আর অনন্ত ওদের পেছন পেছন এক পা দু পা করে এগিয়ে গেছে। মেলায় যাওয়া মানুষগুলি আনন্দে উদ্বেল, মুখে মুখে হাসি। যুবক - যুবতির উচ্ছলতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে রাজপথ।

অনন্ত চলার গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়ে পবিত্রের পাশে এসে দাঁড়াল— 'তোর কী হয়েছে? মুখে কোন কথা নেই যে?'

পবিত্র মাথা তুলে হেসে বলল—'চল্ চল্। এগাতে থাক। তোরা এগিয়ে যা আমি ঠিক পৌঁছে যাব।

অনন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—'তোকে একটা সত্যি কথা বলছি, পবিত্র। তুই যদি আমাদের সঙ্গে এসে বিরক্ত বোধ করে থাকিস তাহলে এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যা। বৌদি আর ছেলেমেয়েদের আমরা মেলা দেখিয়ে দেব। এভাবে মনমরা হয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। তোকে তো আমরা বলি দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি না। মেলা দেখার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ছেলে মেয়ে স্ত্রী আনন্দ স্ফূর্তি বলে একটা কথা আছে। তোর ইচ্ছা না থাকলেও কিছু কাজ ওদের জন্য করতেই হবে।'...

অনন্তকে বাধা দিয়ে সে বলে 'আমি কোন রকম বিরক্ত বোধ করছি না। আসলে মনে মনে কিছু একটা ভাবতে ভাবতে পথ চলতে ভাল লাগে। তুই এগিয়ে যা। আমাদের ফুনুটা যা দুষ্ট একটু খেয়াল রাখিস।'

'তোর সংসারি হওয়ার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল ছিল' বলে ক্ষুন্ন অনন্ত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের আর পবিত্রের পরিবার দুটির সঙ্গে মিলে গেল। আজ কিছুদিন থেকে কী হয়েছে পবিত্র কিছুই বুঝতে পারছে না। সবকিছুর প্রতিই সে উদাসীন। আনন্দ-স্ফূর্তি, ছেলে মেয়ে, সংসার সমস্ত কিছুর প্রতিই। গ্রামের সীমান্ত শহরে সে খুব একটা প্রয়োজন না হলে যায় না। একটা মাঠ পার হলেই বড় শহরটার উপকণ্ঠ অঞ্চল আরম্ভ হয়েছে। দিন রাত মানুষ অবিশ্রান্ত চলেছে শহরের দিকে। পবিত্র নগরমুখি ভিড়ে নেই।

নগরে সে নিজে না গেলে কি হবে। আজ কিছুদিন ধরে নগরটাই ধীরে ধীরে তাদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। তার এরকম মনে হয় যে মস্ত একটা অজগর বিরাট বড় একটা মুখ মেলে তাদের গ্রামটাকে গিলে ফেলতে চাইছে। মাঠ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশাল কংক্রিটের দালান উঠেছে। শৈশবে নানা ধরনের আজগুবি কথায় আড্ডা মারা বড় সেতুটার কাছে একটা বিরাট নাসিংহোম গড়ে উঠেছে। একসময় বড় সেতুটা গ্রাম আর নগরের সন্ধিস্থলে ছিল। এখন সেই সীমা, আগ্রাসী নগরটা ভেঙে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। নাসিংহোমটা পুরোপুরি এক বিঘা উর্বর জমি গিলে ফেলেছে।

নগর এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রের গ্রামটির ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। মানুষগুলি কি এক অবুঝ স্ফূর্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামটা যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। গ্রামে কিছু অপরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে সে তার কোনরকম হদিস পায়নি। পরিচিত মানুষগুলিও যেন কেমন অপরিচিত হয়ে পড়েছে। একটু দাঁড়িয়ে পাড়া প্রতিবেশীর কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করার তো কারো সময় নেই।

গ্রামে অজস্র নতুন দালান গড়ে উঠেছে। ক্রমশ নগরেরই অংশ হতে চলা গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি ঋণ করে ঘর ভাড়া নিয়েছে। আগুন দামে বিক্রি হয়েছে গ্রামের জমি - বাড়ি, মাঠ - ঘাট। নামঘরটার পাশে সেই কোন যুগ থেকে দেখে আসা বড় বড় গাছগুলি কেটে সেখানে তৈরি হয়েছে কয়েক মহলা হাউসিং কমপ্লেকস। নগরে ক্রমশ বেড়ে চলা জনসংখ্যার চাপেই নাকি জায়গার অনটন দেখা দিয়েছে। তাই আশপাশের গ্রামগুলিতে মানুষের ঢল নেমেছে।

পবিত্রের গ্রামে এখন শহরের মতো অবিরাম কোলাহল। পাকা ঘর বানানোর রাজমিস্ত্রি আর শ্রমিকদের অনবরত চিৎকার চেঁচামেচি, লোহা, সিমেন্ট, ইট বালি বয়ে নিয়ে আসা ট্রাকের অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ, তীব্র গতিতে যাওয়া স্কুটার, মোটর বাইক, গাড়ির শব্দ, গ্রামটার প্রাচীন নির্জনতা ভেঙ্গে খানখান করে দিয়েছে। তাকে 'সন্ন্যাসী, হাইঠা যাই বলুক না কেন পবিত্রের কাছে এরকম পরিবেশ একেবারেই অসহ্য। মাঝে মধ্যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

পবিত্র একটা কথা বুঝতে পারছে না, মানুষগুলি হঠাৎ কোথা থেকে এত টাকা পেল। বাড়ি তৈরি করছে, দামি গাড়ি মোটর স্কুটার বাইক কিনছে। শহুরে হয়ে উঠার আনন্দে দামি কাপড় চোপড় পড়ে যুবক যুবতিরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপ তাদের হাতে এসে গেছে। ছেলে - বুড়ো সকলেরই মুখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, জনপ্রিয় সিনেমার গান, পপ সঙ্গীত, মাইকেল জ্যাকসনের কথা।

হঠাৎ বেড়ে ওঠা এই ভিড়, ঠেলা, ধাক্কা পবিত্রকে যেন একা করে ফেলেছে। সে কেবল বোকার মতো দেখছে আর দেখছে। কিছুই বুঝতে পারছে না, কিছু করতেও পারছে না। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে সে স্থির হয়ে থেমে যাচ্ছে। দিন রাত নিজরার বকুনি খাচ্চে, সঙ্গীরা তার বোকামিতে হাসছে, 'হাইঠা' সন্ন্যাসী বলে কত যে ঠাট্টা বিদ্রূপ। সে কিন্তু অচল অটল।

অনন্ত তাকে পরামর্শ দেয়— 'এরকম গোল্ডেন চান্স আর পাবে না। সময় সুবিধে থাকতে থাকতেই পারমানেন্ট কিছু একটা কর। বোকামি করিস না। খেতি বাড়ি করে পেট চালান যায় না। ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছে। তাঁদের ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা কর।' কথাগুলি শুনে পবিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা সেও চিন্তা করে। কিন্তু সে কোন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছে না। কোথা থেকে আরম্ভ করবে সে?

অনন্ত বল। 'তোর এত জমি বাড়ি। কিছুটা বিক্রি করে দে। ভাল দাম পাবি। সেই টাকা দিয়ে ঘর তৈরি করে ভাড়া দে। শহরের লোকরা ভাড়া ঘরের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। নাহলে নিচু জমিগুলিতে চা - বাগান বানান। হাইয়ার প্রাইসে গাড়ি কিনে নে। যদি নিতে চাস তাহলে বল আমি ব্যবস্থা করে দেব। গাড়ি রিফাইনারিতে দিয়ে দিবি। চোখ বুজে ঘরে বসে দিনে হাজার দশেক মতো পাবি। তোর মতো আমার জমি বাড়ি থাকত তাহলে দেখতি আমি কত কী করে ফেলতাম। পোনা কাকতি কী চি মনে নেই। একবেলা খেলে আরেক বেলার কোন ঠিক থাকত না। চালচুলো হীন ভিখিরি। এখন বোধ হয় তার ছেলেরা লাখ ছাড়া কথাই বলে না। আমিনুরকে দেখেছিস। মানুষের ট্যাকসি চলাত। এখন তিনটে গাড়ির মালিক। ডিলাকস সুপার একটা কিনবে বলে ভাবছে। দেখ টাকায় মানুষ কী না করতে পারে।

এই সমস্ত কথায় পবিত্র মৌন হয়ে ধীরে ধীরে বলে— 'পোনা কাকতির ছেলেগুলি কে কিভাবে টাকা রোজগার করছে তুই কি জানিস না? ভুয়ো উগ্রপন্থী সেজে আত্মসমর্পণ করে এখন ডি. আর. ডি. এর কনট্রাকটর। অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার করে কোটিপতি হয়েছে। আমিনুরের দুই নম্বর কারবার রয়েছে। সে ড্রাগ পেডলার। আমাকেও তুই সেরকম হতে...'

অনন্ত তাকে বাধা দেয়— 'টাকা রোজগারের কি সৎ অসৎ বলে কোন নির্দিষ্ট উপায় আছে। আজকাল দুই নম্বরি না করলে তুই কিছুই করতে পারবি না। এভাবেই শেষ হয়ে যাবি। কিছু অর্থহীন সস্তা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে তোরই বারটা বাজবে। তবুও তুই সৎ পথেই টাকা রোজগার কর না আমার দেখানো পথগুলি একটাও অসৎ পথে রোজগার নয়।'

পবিত্র বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার বাল্যবন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই অনন্তই শৈশবে একদিন নিজের নতুন প্যান্ট সার্ট এক জোড়া চুপি চুপি ঘর থেকে নিয়ে পাশের কৈবর্ত গ্রামের সহপাঠী মোহনদাশ দিয়েছিল বলে বাবার কাছে গাল আর মার খায়নি? শার্ট প্যান্ট ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বাবা রুদ্রমূর্তি ধরে ভয়ও দেখিয়েছিল কিন্তু অনন্ত তাতে ভ্রুক্ষেপও করেনি। বাল্যবন্ধু গরিব বলেই সে শার্ট ফিরিয়ে আনেনি। ন্যায় আর সততার প্রতীক্ষ স্বরূপ এক সময়ের বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বাল্যবন্ধুর কথা শুনে পবিত্র নিজের কান দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারে না। এসব সে কী শুনছে? এই অনন্ত তো তার পরিচিত বাল্যবন্ধু অনন্ত নয়।

পবিত্র হেসে অন্য প্রসঙ্গে যাবার চেষ্টা করে। সে বলে—'ও সব কিছু একটা করা যাবে আমার তো এভাবে চলতে কোন খারাপ লাগছে না।

—'ভাল লাগা খারাপ লাগার কথা নয়। তোর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বলছি। তোর ছেলেমেয়ে পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বলছি। তুই যা ভাল বুঝিস কর। তোর ইচ্ছা। আমি তোকে জোর করব না।'

পবিত্র পরিবেশটা হালকা করতে চেয়ে করে—'কিছু একটা হলে কিছু একটা করব। তোরা তো আছিসই। এখন বল সেদিনের ভাওনা সম্পর্কে কি ভেবেছিস? আমাদের নামঘরে অনেকদিন ধরে ভাওনা হচ্ছে না, দিলীপ যদি অর্জুনের অভিনয় না করে তাহলে আমিই করব। সংলাপগুলি খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত হয়।',

পবিত্রের এসব কথায় অনন্তের বিরক্তি ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। সে বলে —ধ্যাৎ। তোর দ্বারা কিছুই হবে না। আমি কোথায় তোকে টাকা পয়সা উপার্জন করার রাস্তা বলে দিলাম। আর তুই কিনা নাটক আর অভিনয় নিয়ে মেতে আছস। এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তোর কিছুই হবে না পবিত্র। তোর যা করার কর। আমি এলাম।'

অনন্ত দ্রুত চলে যায়। দুই একদিন আর এমুখো হবে না। আবার এসে একই কথা পবিত্রকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। সে কিন্তু গোল্ডেন অপারচুনিটিকে কাজে লাগাতে পারেনি। গ্রামের সবাই কিছু না একটা কিছু করছে। সময়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে। এমনকি তার আদর্শবাদী বন্ধু অনন্তও এর ব্যতিক্রম নয়। পবিত্রকে একঘরে করে রেখে সবাই যেন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সে একটা বিন্দুতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজেরাও সব সময় এই কথা নিয়েই তাকে কথা শোনায়। কিছু এক কর। নাম গান করে আর ভাওনা করে ঘুরে বেড়ালে পেট ভরবে না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে।

কথাগুলি সে কেবল চুপ করে শুনে যায়। উত্তর দেয় না। প্রতিবদও করে না। লোকেরা তাকে বোকা, অসল, হাইঠা পাখি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে থাকে। সে সমস্ত কিছুই নির্বিবাদে হজম করে ফেলে। অনন্ত তাকে বুড়ো মানুষের মতো রক্ষণশীল বলে হাসে। প্রগতিশীলতা যে কী জিনিস বুঝতে পারে না। অনন্ত কি প্রগতিশীল নাকি? হতেও পারে। তার মনটা বোধহয় একজন বুড়ো মানুষের মতোই নতুনকে গ্রহণ করতে না পারা রক্ষণশীল।

গ্রামে তাঁর মনের সঙ্গে মিল থাকে দুজন বুনো মানুষ রয়েছে ক্লাস ফাইভে পড়া বড় ছেলেটি গ্রামের ধরণী বায়েনকে ধুতি পরা দাদু বলে। ধুতি পরা মানুষ গ্রামে কমে এসেছে। সব সময় ধুতি পড়ে ঘুরে বেড়ানো ধরণী বায়েন ফুনুর কাছে ধুতি পড়া দাদু। ধরণী বায়েনের সঙ্গে পবিত্রের কোথায় যেন কী একটা মিল রয়েছে। এককালে বায়েন সত্যি সত্যিই গ্রামের ধরণী স্বরূপ ছিল। আশি বছরের এই বৃদ্ধ ছিলেন খেলার যাদুকর। তাঁর নাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। বায়েনের যাদুকরী কণ্ঠের কীর্তন ঘোষা বরগীতের সুর মানুষকে কয়েক দশক মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। শুধু কি তাই? পবিত্র অনন্তদের কত কষ্ট করেই না নাটক, ভাওনা, গীত শিখিয়েছিল। এমনকি জ্যোতিপ্রসাদ, রাভা, পার্বতী প্রসাদের গানও ধরণী বায়েন গেয়ে শোনাত। হাইস্কুলের মঞ্চে আধুনিক নাটক 'সিরাজ', 'গরীবের আজান' অভিনয় করে দর্শকদের চোখ জলে ভাসিয়েছিল। ধরণীর বায়েনের ঢোলের শব্দে গ্রামে হুচরি নতুন প্রাণ লাভ করত।

ধরণী বায়েন ছিলেন একজন নিপুণ শিল্পী। কাঁঠাল কাঠ দিয়ে বায়েন সাতমহলা, তিনমহলা সুন্দর সুন্দর সিংহাসন তৈরি করতেন। বায়েনের শিল্পী হাতের স্পর্শে সে সব জীবন্ত রূপ লাভ করত। রাস মেলার ভাওনার মুখোস সাপ ফণাযুক্ত বাঁশের কাঠির ভয়াল কাল - নাগ বানাতেন।

এহেন ধরণী বায়েনকে গ্রামের মানুষেরা ধীরে ধীরে ভুলে গেলে। তার অপূর্ব কণ্ঠে কফ বাসা বাঁধল। নানা রোগ ব্যধিতে জর্জরিত দুর্বল ধরণী বায়েনের কাছে এখন আর আগের মত মানুষের ঢল বয় না। কোমরে জোর নেই। আগের মতো আর বাইরে এখানে যেতে পারেন না। তবুও নামঘরে ভাওনার আয়োজন হলে কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপে এখনও এসে উপস্থিত হন।

পবিত্র প্রায়ই বায়েনের বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনেরই মনের মিল রয়েছে। দুজনেই অনুভব করে কী এক অন্ধকার যেন গ্রামটাকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলছে। এক, বোঝাতে না পারা হাহাকার দুজনেই শুনতে পায়। দুজনেই বোঝাতে না পারা একটা করুণ দৃশ্যের অসহায় দর্শক। বায়েন জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, গ্রামের যুবকরা খোলা বাজানো শেখার জন্য আমার কাছে দেখছি আজকাল আর আসে না। তোদের পরে আরও দুই বছর কেউ কেউ এসেছিল। এখন দেখছি এ পথে কেউ আর হাঁটছে না।' পবিত্র কোন উত্তর না দিয়ে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে— 'অনন্তরা কী বলে জানেন জ্যাঠ্যা?' বুড়ো ঘোলা উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। 'ওদের মতে নাটক - ভাওনা, গীত, ঢোল, খোল এসব দিয়ে কিছুই হবে না। এখন কেবল যে কোন উপায়ে টাকা উপার্জন করা প্রয়োজন। টাকা রোজগার করে মৌজ করে খেয়ে পরে থাকা দরকার।'

বায়েন বলে ওঠে—'ও কে জিজ্ঞেস করিস তো টাকার জন্য সে তার মাকেও বিক্রি করে দিতে পারবে কি না?' যারা টাকা, ভাওনা করে তারা কি খেয়ে পরে বেঁচে নেই। পবিত্র কোন রকম মন্তব্য করে না।

—'তুই ও কি শেষ পর্যন্ত ওদের দলে নাম লিখিয়েছিস নাকি?'

—জ্যাটা, ঘরের বৌ দেখছি ওদের কথাতেই সায় দেয়। কখনও কখনও ভাবি ওরাই বোধহয় ঠিক। আমাদের বোধহয় পণ্ডশ্রমই। এখন ভাবছি ওদের কথামতো চললে অন্তত পারিবারিক শান্তিটা তো বজায় থাকবে। তবে জানি কী জ্যাটা, আগুনে ঝাঁপ দেব বললেই তো আর ঝাঁপ দেওয়া যায় না।'

বায়েন প্রতিদিনের মতোই বলে— 'গুরুজনদের দেখানো পথ ছেড়ে দিয়ে মানুষগুলি কী যে অলীক স্বপ্নের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধন দৌলত বিষয় সম্ভোগ কার না প্রযোজন। এসবকে বাদ দিতে তো কেউ বলছে না। কিন্তু তা বলে নিজের...' পবিত্র মাঝখানেই বলে ওঠে— 'ওদের কোন আদর্শ বোধ নেই। অর্থই ওদের গুরু। বিষয় ভোগই হল আদর্শ। মনে হয় ওরাই ঠিক বলছে নাকি?'

পবিত্রের কথায় বায়েন কোন জবাব দেয় না। তার মুখটা এক বোবা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ওঠে। করুণ কণ্ঠে বলে 'বাকি দিন কটা ভালভাবে পার হয়ে গেলেই হয়। দেখবি, এটা ঘোর কলিকাল। ভগবান সইবে না। এর পরে মহাপ্রলয়। কলির অন্তে কল্কি অবতার হবে।

সবাইকে মেরে কেটে শেষ করবে। সত্য, সত্য, সত্য। একটা টিকটিকি কোথা থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ঠিক ঠিক ঠিক। বুড়ো বুনরায় তিনবার মাটি ঠুকে বলে' একটা কথা তোকে আমি বলে গেলাম। আমার মৃত্যুর পরে মুখাগ্নির সময় তুই আমার সামনে থাকতে ভুলে যাস না। নাম গান গাবি।'

এখনটাতেই বায়েনের সঙ্গে পবিত্রের অমিল। বায়েনের কল্কি অবতারে তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। ভগবান অবতার হয়ে পৃথিবী রক্ষা করবে অসৎকে ধ্বংস করবে, এই জাতীয় কথায় পবিত্র তিলমাত্র বিশ্বাস করে না। তার দুঃখ অন্য জায়গায়। এই যন্ত্রণা সে বোঝাতে পারে না। অনুভব করছে কিছু একটা হারিয়েছে। একটা সুর হারিয়েছে। প্রতিদিনের শোনা যে সুর বুকটাকে শান্ত করে তোলে। আজ থেকে কিছুদিন আগেও সে সুরটা শুনতে পেত। বায়েনরা চিনতে পেরে ছিল সেই সুর। হঠাৎ যেন সেই সুরটাই হারিয়ে গেছে।

কিসের সুর? বরগীত কীর্তনের অনুপম সুর? নাকি ঢোল খোল নাগরার তাল মান লয়। সুরের সুতোটা কে যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। হঠাৎ সমস্ত কিছুই কটু আর নীরস লাগে। এই সেদিন পর্যন্ত গ্রামের হুচরিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানুষের সুন্দর সমাজটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আজ আর সামাজিকভাবে কাঠে মেজির ভোজের আয়োজন করা হয় না। নামঘরে কয়েকটা দল। নিজেদের দলাদলির আর শেষ নেই। আগের মতো হাইস্কুলের মঞ্চে ছেলেরা আধুনিক নাটক, গান - বাজনা করাও ছেড়ে দিয়েছে।

সুরের সুতোটা কে টানা হেঁচড়া করছে, পবিত্র তার কোন হদিশ পাচ্ছে না। ধরণী বায়েনরা অন্তত তার চেয়ে সুখি। তাঁদের কিছু একটা বিশ্বাস আছে। মৃত্যুর পরে বৈকুণ্ঠ লাভের স্বপ্ন বায়েনদের বিভোর করে রেখেছে। এই সরল বিশ্বাস নিয়েই তাদের মৃত্যু হবে। কিন্তু তার? সে কী নিয়ে থাকবে? কিছুকাল আগে পর্যন্ত গ্রামের ছন্দোময় জীবনের মধ্যে সে মহা আনন্দে জীবন পার করেছিল। সে ভেবেছিল পরিবর্তন আসবে। স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। এককালে যেরকম একটা বড় পরিবর্তন চেয়েছিল অনন্তরা। এই পরিবর্তনে চিরকালীন সুরটা হারিয়ে যায় না। কিন্তু হঠাৎ কী হয়ে গেল। প্রকাণ্ড কালো ঝড় সমস্ত কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল। শৈশবে বায়েনদের মুখে শোনা একটা সুন্দর গায়েনের কলির সুর পবিত্রকে মাঝে মধ্যে উতলা করে তোলে। সুরটা যেন তাকে উদ্দেশ্য করে বলে— 'এই স্বপ্নে বিভোর সুর পরিবর্তনের সময় এসেছে তোর। পুরনোকে নতুন করে গড়ে নিবি, সুর পরিবর্তনের সময় এল তোর।' পবিত্র সুর পরিবর্তিত করতে পারল না। একটা সুরেই সে আবদ্ধ হয়ে রইল। পুরানোকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাল্যবন্ধু অনন্ত। কোথায় সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল? সে দেখছি নিজেই অসুরের সুরে বন্দি হয়েছে। পরিবর্তে এখন মনে হয় একটা মরুভূমির মধ্য দিয়ে একটা অজগর সাপের পেটের মধ্যে সে ঢুকে যাচ্ছে।

* * * * *

মেলায় যাবার পথে সন্ধের একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় তার হাসিও পেল, দুঃখও হল। শিয়ালের হুক্কা হুয়া শুনে ফুনু তাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরেছিল।

—ওটা কী ডাকছে বাবা?

পবিত্র হাসবে না কাঁদবে? সে নিজরাকে চিৎকার করে বলল— 'এই যে শুনছ, ছেলের কথা?'

নিজরা পাকঘর থেকে বেরিয়ে এল। তোমার ছেলে শিয়ালের ডাক চিনতে পারছে না। কী করা যায়?'

নিজরা ধমকে উঠল—'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে আমিও এই গ্রামে শিয়ালের ডাক শুনিনি। ও কোথা থেকে শুনবে?' কথাটা পবিত্র ভেবে দেখেনি। গ্রামের এত শিয়াল গেল কোথায়? এক সময়ে শিয়াল কুকুরের লড়াই থামানোর জন্য তাদের রাতের বেলা হাতে টাঙ্গোন নিয়ে তাড়া করতে হত। নিজেরার সঙ্গে তর্ক করার জন্য সে বলল—'আচ্ছা, আচ্ছা তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু বোমার শব্দ টাইম বোমার শব্দ সে কি শুনেছে?'

স্বামীর কথা বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করল —'তার মানে?'

'কেন সেদিন টাউনের বাসস্ট্যান্ডে ফাটা বোমটার শব্দ এখান থেকে শুনেই সে টাইম বোমা বলে চিৎকার করে উঠেছিল। ওটা বোমা না কীসের শব্দ সে কিভাবে বুঝতে পারল?' বোমার শব্দ তো সে আগে কখনও শোনেনি।' বোকা মানুষটার কথা শুনে নিজরা হেসে ফেলে। তোমার যে কথা। আজকাল কার ছেলে বোমা বন্দুকের শব্দ চিনতে পারবে না? টিভিতে দেখছে। খবরের কাগজ পড়ছে। তুমি না হয় শিয়ালের ডাক, পাখির ডাক, ঢোল খোলের জগৎ নিয়ে ডুবে আছে। এসব আর কীভাবে জানতে পারবে? অনন্ত ঠিকই বলে। তোমার মনটা বুড়ো মানুষের মতো। ধরণী বায়েনের মতো বুড়ো মানুষদের সঙ্গে দিন রাত আড্ডা মারলে বুড়ো না হয়ে কী হবে।?

নিজরার কথাটা নীরবে শুনে গেল। তার কানের কাছে পুরনো গানের কলিটা পুনরায় গুণ গুণ করে উঠল—'সুর পরিবর্তনের সময় এল তোর।' পবিত্র সিদ্ধান্ত নিল, সে সুর বদলাবে। সে অনন্ত নিজরা দিলীপদের দলে যোগ দেবে। সে তার আত্মাটাকে হত্যা করবে। সে ধন সঞ্চয় করবে। ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। নতুন সুরের তালে তালে সে উন্মাদ হয়ে নাচবে।

—কী ভাবছ?

নিজরার প্রশ্নে সে চমকে উঠল। 'শিয়াল টিয়াল বাদ দাও। আমরা একটু পরে মেলায় যাব। ফুনু জোনটি বায়না ধরেছে।'

'একা যাবে!'

'এই বাড়ির পাসেই বসেছে মেলা। নগরে যখন মেলা হয়েছিল তখন তো দূরত্বের অজুহাত দেখিয়ে নিয়ে যাওনি। এবার কিন্তু বাধা দেবে না। অনন্তরাও যাবে। তাঁদের সঙ্গেই যাব।'

পবিত্র কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল— 'দাঁড়াও। আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছ। আমিও তো যে পারি।' এবার নিজরার চোখে সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়। সে প্রায় চিৎকার করে উঠল— 'কী বলছ? তুমি মেলায় যাবে?' নিজরা স্ফূর্তিতে আর বেশ কিছু বলতে পারল না। সে ফুনু আ সোনটিকে 'বাবাও মেলায় যাবে' বলে চিৎকার করে জানাল। ফুনু উল্লালিত হয়ে উঠল।

মেলার উদ্দেশে মানুষের ঢল নেমেছে। পবিত্রদের গ্রামের অর্ধেক লোক চলে এসেছে মেলাতে। যারা একবার এসেছে তারা আবার আসছে। বিশাল মেলা। অনেক আশ্চর্য ধরনের খেলার আয়োজন রয়েছে মেলায়। বড় নগরটার অংশ হয়ে পড়া পবিত্রদের গ্রামের যুবক যুবতিরদের পরনে বিচিত্র ধরনের পোশাক। যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুটার বাইকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পোনা কাকতির মতো যারা উঠতি বড়লোক তারা সবাই মোটর গাড়ি করে যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরের মানুষগুলির মুখ গর্বে ফুলে উঠছে। পায়ে হেঁটে যাওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে তারা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে।

মেলা লোকে লোকারণ্য। রঙিন লাইটগুলি জ্বলছে আর নিভছে। বিরাট একটা চরকিতে বুড়ো থেকে যুবক সবাই উঠেছে। তাঁদের মুখে উজ্জ্বল হাসি। একটা লোহার গোলকের ভেতরে দুজন খেলোয়াড় মোটর সাইকেল চালাচ্ছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর খেলা। ফুনু, সোনটি, নিজরার চোখে মুখে অপার বিস্ময়! তার একবার এদিক আরেকবার ওদিকে তাকাচ্ছে। হাতে একটা জর্দা পান নিয়ে অনন্ত উপস্থিত হল। পবিত্রের দিকে তাকিয়ে নিজরাকে বলল, 'এই অকাল বৃদ্ধাটাকে যে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছে তার

জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। একে চাকরিতে ওটাও ঐ পবিত্র দেখ গে যা রামেশ্বর পিসে চাকরিতে ঘুরছে। তুই কি পিসের থেকে বেশি বুড়ো হয়েছিস?' অনন্ত হাতে পানটা পবিত্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল— 'নে, পান খা। বেনারসি পান। মুখটা সুগন্ধে ভরে যাবে।' পবিত্র পানটা মুখে ভরে নিল। জর্দার গন্ধে তার মুখটা ভরে উঠল। মেলার প্রধান গেটের পাশে একটা বড় সাহেবের মূর্তি। অবিকল মানুষের মতো। মূর্তির মাথায় একাট স্ট্রাইপ দেওয়া লম্বা টুপি। কিছু সময়ের ব্যবধানে সাহেব হাতের টুপিটা খুলে দর্শককে অভিনন্দন জানিয়ে একবার ইংরেজিতে, একবার হিন্দিতে বলছে— 'ওয়েলকাম টু গ্রেট অরিয়েন্টাল কার্নিভাল।' আবার এই কথা হিন্দিতে বলছে।

সাহেবের অভিনন্দন পেয়ে ফুনুরা হেসে গরিয়ে পড়ল। নিজরা, অনন্ত সবাই হাসছে। বেনারসি পানের নেশায় পবিত্রের মাথাটা ঝিমিঝিম করছিল। সেও মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারা টিকিট কিনে প্রধান গেট দিয়ে মেলায় প্রবেশ করল। ভেতরে ঢুকেই তারা ইলেকট্রনিক্সের হনুমান দেখতে পেল। হনুমান মাথায় গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে উড়ে এসে নিচে নামছে। নিচে লক্ষ্মণ শুয়ে রয়েছে। ইলেকট্রনিক্সের হুনমানের খেলা দেখে সবাই বিভোর। মানুষ মন্তব্য করছে— 'হ্যাঁ, এসব হল খেলা। কি আশ্চর্য খেলা দেখাচ্ছে।' বেনারসি পান খেয়ে নেশাগ্রস্থ পবিত্রের দুচোখে অপার বিস্ময়। অনন্ত তাকে বলল, 'দেখেছিস খেলা। তুই তো মেলায় আসতেই চাইছিলি না।'

এঁকে বেঁকে চলেছে পুতুলের রেলগাড়ি। রোলার কাষ্টার। অজস্র খেলা। একদিনে দেখে শেষ করা সম্ভব নয়। এখানে সেখানে জুয়োর বোর্ডও বসেছে। সেখানে মানুষের বেশ ভিড়।

বেনারসি জর্দা পানটা পবিত্রের বেশ নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। পবিত্রের আরও একটা খেতে ইচ্ছা করছে। স্টল দুটির মুখটাতে বেশ ভিড় পবিত্র অনন্তকে জিজ্ঞেস করল— 'এই স্টল দুটিতে বেশ ভিড়। কী বা দেখাচ্ছে'?

—'চল। ভেতরে চল। দেখার মতোই।'

পবিত্ররা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল। স্টলের ভেতরে ঈষৎ হলদে আলো। দুটি প্রায় উলঙ্গ যুবতি তাঁদের স্বাগত জানাল। নিজরার মুখটা কুঞ্চিত হয়ে গেল। ছিঃ, এদের কি লাজ লজ্জা বলতে কিছুই নেই।' স্টলের ভেতরে একটা অদ্ভুত আয়নার সম্মুখীন হল তারা। আয়নায় সৃষ্ট হওয়া তাঁদের প্রতিবিম্বগুলি বিকৃত। তারা ওকে জন বামনে রূপান্তরিত হয়েছে। হাত পা গুলি ছোট ছোট বেঁটে। মুখগুলি বেলুনের মতো ফোলা। কিম্ভূতকিমাকার প্রতিবিম্বগুলি দেখে নিজরাদের হাসি পেয়ে গেল। আগু-পিচু করে হাত পা নেড়ে চেড়ে তারা প্রতিবিম্বগুলি দেখতে লাগল। পানের নেশায় পবিত্র নিজের ফুনুদের অদ্ভূত রূপ দেখে মুচকি হাসতে লাগল।

অপর স্টলটির ভেতর থেকে এক স্ক্রীন। টিভির স্ত্রীনের মতো। একটি উলঙ্গ মেয়ে সুইচ টিপে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনে পবিত্র নিজরার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। তাঁদের ছবিগুলি একবার বড় হচ্ছে একবার ছোট। হঠাৎ কর্কশ মিউজিক বেজে উছল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের প্রতিচ্ছবিগুলি বিকৃত হয়ে গেল। পবিত্র দেখে তার শরীরের ওপরে মাথাটা নেই। পা দুটি মাঝখান পড়ে আছে। ফুনু, সোনটি, নিজরা প্রত্যেকেরই হাত পা গুলি ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেছে। তাঁরা হাসলে কাটা মাথাগুলিও হাসেছ। কী অদ্ভুত। পবিত্র নিজের মাথা হাত দিয়ে দেখল–আছে না নেই? না ঠিকই আছে। ফুনু ভয় পেয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

নিজরা বলল— 'এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই চল। কেন জানি ভাল লাগছে না।' মিউজিক স্বাভাবিক হল। তাঁদের প্রতিচ্ছবিগুলিও স্বাভাবিক হয়ে এল। পবিত্ররা তাড়াতাড়ি করে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রধান গেটের বাইরে হিন্দি সিনেমার চটুল জনপ্রিয় গান কলরবের সৃষ্টি করেছে। মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। দূর দূরান্ত থেকে নতুন নতুন লোকজন আসছেই। অনন্ত বলল— 'দেখলি, অবাক হওয়ার মতো না? বিজ্ঞানের খেলা। বিজ্ঞান যে কি না করতে পারে।' পবিত্র কোন মন্তব্য করল না। সে যেন কী এক গভীর চিন্তায় বিভোর।

অনন্ত পুনরায় জিজ্ঞাস করল— 'তুই একটা খবর পেয়েছিস কি না?'

পবিত্র চমকে উঠল। 'কী খবর? বল তো।'

'আমি এই একটু আগে জানতে পেরেছি। তোদের আর বলিলি, মেলা না দেখেই ফিরে যাবি বলে।' পবিত্র, নিজরা তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অনন্ত ধীরে ধীরে উদ্বেগহীন কণ্ঠে বলল— 'বিশেষ কিছু নয়। দুঘন্টা আগে ধরণী বায়েনের মৃত্যু হয়েছে'

পবিত্রের বেনারসি পানের নেশা ছুটে গেল। চারপাশের রঙিন আলোগুলি চোখের সামনে দপ্ করে নিভে গেল। তার মাথাটা মেলার বড় চরকিটার মতো বোঁ বোঁ কেরে ঘুরতে লাগল।

ধরণী বায়েনের মৃত্যু হয়েছে। পবিত্র চারপাশে অন্ধকার দেখল। তার বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। সে অনুভব করল একটা মহাশূন্যের ঘূর্ণি যেন তাঁদের গ্রামে উৎপত্তি হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। —'আমার মৃত্যুর সময় পাশে থেকে নাম গান গেয়ে শোনাবি।'

পবিত্র দেখল স্ক্রীনটাতে ধরণী বায়েনের কাটা মুণ্ডুটা নিচে পড়ে রযেছে। হাত পা গুলি এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মণিকূটের সিংহাসন টুকরো টুকরো হয়ে দূরে ছিটকে পড়েছে। ক্যাসেটের গানগুলি তার কানে বিকৃত হয়ে বাজছে...। কে যেন গুণ গুণ করছে...হের স্বপন বিভোর।'...

মাঝখানটা পরিবর্তিত...সুরের মায়াজাল পরালি...। রাখাল হের।... রাখাল... সুরের দেউলে...। এবার সে স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছে। কে যেন শোক বিহ্বল কণ্ঠে গাইছে—'আলো মঞ কি কহব দুঃখ। পরাণ নিগরে মোর...

দূরের গ্রাম থেকে আবছা ভেসে আসা সুর তাকে ডাকছে। হাতের ইশারায় ডাকছে পবিত্র আর দাঁড়াল না। সে গ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগল।

টীকা ঃ হাইঠা — কবুতর জাতীয় এক ধরনের পাখি যা সচরাচর মাটিতে নামে না। নামঘর— আসমের বৈষ্ণবদের সামাজিক উপাসনা গৃহ। ভাওনা — অভিনয়, অঙ্কিয় নাটকের অভিনয়। হুচুরি — বহাগ (বৈশাখ মাসে পালিত) বহু উপলক্ষে দল বেঁধে ঢোল আদি বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি গেয়ে বেড়ানো গীত। বরগীত— শঙ্করদেব আর মাধবদেব রচিত ভক্তিমূলক গীত।

লেখক পরিচিতি ঃ ১৯৪১ সনে অসমের গোলাঘাট শহরে গল্পকার জেহিরুল হুসেইনের জন্ম হয়। শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত গ্রহণ করে শ্রী হসেন কবি আংলং, নাগাল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘকাল গোলাঘাটের কাছারিঘাট স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হোমেন বরগোহাঞি সম্পাদিত 'নীলাচলে' হুসেনের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। লেখকের প্রথম গল্প সংকলন 'দুবরি বনের জুঁই ১৯৯২ সনে প্রকাশিত। 'রাঙ কুকুরের টুটি' লেখকের একটি অন্যতম গল্প সংকলন। ২০০৫ সনের মে মাসে লেখকের মৃত্যু হয়।

মূল অসমিয়া থেকে বাংলা অনুবাদ - বাসুদেব দাস